Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 414 – 424
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যাত্রা-সাহিত্যে স্ত্রী লিঙ্গ

অনুদাত্ত মল্লিক
স্বাধীন গবেষক
Email ID : anudattooffi@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Jatra, Female, Patriarchal, Orthodoxical, Suppression, Provocative, Motherhood, Identity, Freedom, Revolt.

Abstract
Boys portraying female characters in jatra has been a longstanding practice with far-reaching implications. Just like male individuals convincingly portrayed female characters, the patriarchal society also dictated the representation of female characters in jatras. Women characters were granted a degree of freedom while maintaining underlying structures of patriarchal power and control. In jatra, women were presented through a wide range of characters like mythological goddesses, historical figures, ordinary women and many more. These characters were crucial for conveying the narratives and emotions of the stories presented in the palas. Women were frequently portrayed as powerful goddesses like Radha, Dyuti, and queens. These portrayals added a spiritual and mythological dimension to the characters. On the other hand, female individuals were considered as provocative or sexually suggestive characters in Vidyasundar pala. Female characters were also frequently confined to domestic roles, such as homemakers and caregivers. Their identities and value were tied to their ability to fulfil traditional gender roles. Female characters were often economically as well as mentally dependent on male family members or spouses, making them vulnerable to exploitation and control. It is important to note that while jatra often portrayed the suppression of female characters by patriarchal mentality, it could also be a powerful tool for critiquing and challenging these norms. This trend, although initiated during nineteenth century, was actually much more prominent in the twentieth. Works of many palakars like Nilkantha Mukhapadhyay, Manamohan Basu, Dhanakrishna Sen, Brajamohan Ray explored the complex ways in which women navigate and resist patriarchal systems, offering insight and inspiration for real-world change. But there was no individual identity for female characters. They were always identified in relation with father, husband or son. Mothers in jatras were often portrayed as paragons of maternal virtue. They embodied qualities of love, care, and selflessness, emphasizing the sacredness of the mother-child relationship. These depictions reinforced societal ideals of motherhood. Despite this multi-faceted representation of female characters, there was no scope of ascension for them with the sole exception of Manamohan Basu. Female characters of his pala got the change to be educated.

Discussion

বাংলা যাত্রার ঐতিহ্য প্রাচীন। যে লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে তার পথ চলা সেই লোকসমাজই এই নাট্যকর্মের শ্রোতা-দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক। ধর্মাচরণের অনুকরণাত্মক উপাদানের ক্রম বিবর্তনে যাত্রার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, তাই যাত্রার ঐতিহ্য শুধুই অতীত নির্ভর নয়, এ এক পরম্পরাও বটে। কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়ে, দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিবেশের বাতাবরণে তার মধ্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ঐতিহ্যের এক ধারা যেমন রক্ষণশীল তেমনই আর এক ধারা গতিশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যাত্রার মধ্যে এই দুই ধারার মিলন দেখতে পাওয়া যায়। ইতি-নেতির এই দ্বন্দ্বে এই শতাব্দীর যাত্রায় চরিত্রদের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন যেমন লক্ষ করা যায় তেমনই একমুখী ভাবনার প্রকাশও ফুটে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসামঙ্গলের কাহিনি নির্ভর যাত্রা প্রভৃতি প্রচলিত থাকলেও, যাত্রা বলতে সাধারণত কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয় দমন যাত্রাকেই বোঝানো হতো। শুধু তাই নয় সেই সব যাত্রার ঘটনা প্রবাহ আবর্তিত হতো নারী চরিত্রদের কেন্দ্র করে। পালার শিরোনাম থেকেই দর্শক-পাঠক তা বুঝতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দী বা তার পূর্ব সময়ে আসলে লিখিত-পাঠ্য নির্ভর যাত্রার পরিবেশন রীতির প্রচলন ছিল না। মৌখিক সাহিত্য হিসেবেই তার পরিচিতি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পালাকারদের মুদ্রিত পালার সন্ধান পাওয়া যায়। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যে যে যাত্রাভিনয়ের প্রসঙ্গ দেখা যায়, সেই পালারও কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় নি, এবং সেখানে চৈতন্যদেবকে যাত্রাভিনয়ে অংশ নিতে দেখা যায়, নারী বেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রার পাঠ্যরূপের মধ্যে নারী চরিত্রের সংখ্যা বিপুল হলেও, বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাত্রায় নারীদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষেরাই। যাত্রার অভিনয়ে নারী চরিত্রকে যেমন পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হতো, তার মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হতো, তেমনই পাঠ্য-রূপের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিলো নারীকে পুরুষের কাছে অবদমিত হতে। নারী তার নজস্ব কোন পরিচয় তৈরি করতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম অধিকারী, সুবল অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, প্রেমচাঁদ অধিকারী প্রমুখ পালাকারের নাম জানা গেলেও তাঁদের পুরো পালার পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত গানের সংকলন থেকে সেই সময়ের যাত্রার বিষয়বস্তুর ধরন আন্দাজ করা যায়, তবে সেখানে নারী প্রাধান্য ছিল প্রবল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যাত্রার বাহ্যিক ও বিষয়গত দিক থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছিলো। এই সময়েই যাত্রার বিবর্তনমূলক ইতিহাসের সূচনা ঘটে। একদিকে কৃষ্ণযাত্রা অন্যদিকে গোপাল উড়ে, নতুন যাত্রা, শখের যাত্রা, গীতাভিনয়ের সূচনা এই পর্বেরই ফসল। কৃষ্ণযাত্রার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও পরিবর্তন কিন্তু সবথেকে বেশি নজরে এসেছিলো এই সময়ে। বিংশ শতাব্দীতেও কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন থাকলেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নাম কৃষ্ণযাত্রাকার হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় গোপাল উড়ে, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন রায়, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, রসিকলাল চক্রবর্তীর নাম। এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন পালাকারের দৃষ্টিতে নারী চরিত্রেরা কখনো একক ভাবে নিজদের পুরুষের কাছে অবদমিত করে 'দাসী' হয়ে থাকতে চেয়েছে বা ভিন্নভাবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলতে চেয়েছে, সমাজ ভাবনার বদল ঘটাতে চেয়েছে। নারী চরিত্রের এই বিভিন্নতার কারণ কিছুটা অনুমান করা যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকে। সেখানে যাত্রাকে 'জঘ্যন্য অপভ্রংশের স্বরূপ' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। স্বাভাবিক নিয়মেই সংস্কৃতির এই অরুচিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা বিভিন্ন পালাকাররা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণযাত্রার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে, তবে তার প্রভাব কমে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে কৃষ্ণযাত্রাকার হিসেবে গোবিন্দ অধিকারীর নাম জানা যায়। কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক পুরাণ, লৌকিক কাহিনি, পদাবলী, চৈতন্যজীবনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে পালা রচনা করেছেন তিনি। এঁর পালায় নারী চরিত্রদের মধ্যে এক ধরনের পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার প্রতি নতি স্বীকার লক্ষণীয়। 'দানলীলা' পালায় দেখা যায় কৃষ্ণের জন্য বিরহী রাধা, আবার সে আয়ানের সংসারকেও অস্বীকার করতে পারে না; কারণ তার সামাজিক সতীত্বের

তকমা। সে স্ত্রী তাই স্বামীর কুল-সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব তার। বৃন্দা তাকে কৃষ্ণের কাছে পাঠাতে চাইলেও আক্ষেপের সুরে রাধা স্বীকার করে নেয় সামাজ-সংসার জীবনের শৃঙ্খলাকে। রাধা যে শাশুড়ি আর ননদিনীর অধীন। তার নিজস্ব কোনো পরিচয় তো নেই। রাধা তাও কৃষ্ণের কাছে পৌঁছোতে চাইলে, নারীর সামাজিক অবস্থান যে কতটা সীমিত তা বৃন্দার উক্তি থেকে বোঝা যায়। রাধা, বৃন্দাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালে বৃন্দা বলে,

"ওগো শ্রীমতী! আমি যে নারী গো! নারী হ'য়ে এমন কাজ করতে নারি গো!"[১]

এ শুধু মানসিক অসহয়তা নয়, সামাজিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলা যে কী প্রবল তাও বুঝিয়ে দেয়। নারীর স্বাধীনতা যে কতো সীমিত তা অনুভূত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রেও নারীর এই অসহায় অবস্থার কথা শোনা যায় যখন রাধা মথুরাতে কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়,

"আমি কুলবতী যুবতী নারী,
চলিতে নারি একা পথে।
. . .
একা যুবতী গেলে পথে,
লজ্জা দেয় লোকে পথে,
নিয়ে যেতে চায় কুপথে,
. . .
নারী যদি যায় গো পথে,
পদে পদে বিপদ্ পথে",[২]

সামাজিক ভাবে নারীর স্বাধীনতা যেমন নেই তেমনই সে সুরক্ষিতও নয়। রাধা তবুও কৃষ্ণ প্রেমে তার কুলবতী যুবতীর তকমাকে অস্বীকার করতে সাহস দেখিয়েছে। এ যেন সামাজিক-মানসিক এক আগল থেকে মুক্ত হওয়ার সূচনা। 'অক্রূর সংবাদ' পালাতে রাধা কৃষ্ণের জন্য নিজের 'অসতী' অপবাদকে মেনে নিয়েছে। 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতিব্রতা নারী। নিজের পরিচয় কিন্তু সে দেয় 'দাসী' হিসেবে। আসলে এই দাসত্বই পুরুষের কাছে রাজত্বের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। নিমাই নিজের অভীষ্ট লাভের আশায় সংসার ত্যাগ করলে বিষ্ণুপ্রিয়াও সংসার ত্যাগ করতে চায়, কিন্তু রাধা সংসার ত্যাগ করতে পারে না। পুরুষ সংসার ত্যাগ করলে নারীর দায়িত্ব তার পরিবারকে দেখাশোনা করা, বিষ্ণুপ্রিয়া তাই করেছে কিন্তু রাধার ক্ষেত্রে তা হয় না। 'অক্রূর সংবাদ' পালাতেই দেখা যায় নারীর সংসার ধর্মের নিঠুর স্বার্থ-শৃঙ্খলা। ব্রজের থেকে কৃষ্ণ মথুরা চলে যাবে এই আনন্দে কুটিলা আত্মহারা হয়েছে কারণ, এখন তাহলে আয়ান দাদার সংসার রক্ষা পাবে। যে সামজিক শৃঙ্খলায় রাধা বাধা পরেছে তা রক্ষা করার দায়িত্ব নারীরই। এই সামাজিক বিধির মানসিকতা নারীর মধ্যে স্বার্থান্বেষী মনোভাব ফুটিয়ে তোলে। কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে চলে গেলে যশোদার বেদনা বা নন্দ গয়লার বিপদের থেকেও প্রয়োজনীয় হয় কুল-সম্মান রক্ষা করা, তাই তো কুটিলা তাদের নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। সে নিজে নারী হয়ে আর এক মায়ের সন্তান না থাকার কষ্ট বুঝতে চায় না। রাধা যেমন সুরক্ষা-হীনতা অনুভব করেছিল তেমন কৃষ্ণ-কালার অনুপস্থিতিতে বৃন্দাবনের দানবের উৎপাত নিয়ে জটিলা চিন্তিত হয়েছে। নারী সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তি সুরক্ষার জন্য সেই পুরুষের ওপরেই নির্ভরশীল হয়েছে, আত্মরক্ষার কৌশল তার জানা নেই। গোবিন্দ অধিকারীর মা চরিত্রের মধ্যে মমত্বের প্রকাশই প্রধানভাবে লক্ষ করা যায়। সেখানে পুরুষ সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। পুরাণ কেন্দ্রিক কাহিনির মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর চরিত্রের পৌরাণিক ধারণার থেকে কোন উত্তরণ নজরে আসে না। চরিত্ররা তার সামাজিক অবস্থানেই আবদ্ধ থেকে বাঁচতে চায়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালাতে নারীকে দেখা যায় আবার কিছুটা ভিন্নভাবে। এখানেও কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা রাধা, কিন্তু পারিবারিক বা পুরুষতান্ত্রিক-শৃঙ্খলার মধ্যে সে আবদ্ধ নয়। জটিলা, রাধাকে পারিপার্শ্বিক সামাজিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করে দিলেও রাধার মধ্যে কোন ভ্রূক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। 'গন্ধর্ব্ব মিলন' পালাতে জটিলাকে দেখা যায় সুমিষ্ট কথা বলে রাধাকে পতিগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী। গোবিন্দ অধিকারীর পালাতে কিন্তু দেখা গিয়েছিলো জটিলা রাধাকে নিয়ে কুমন্তব্য করছে। 'স্বপ্নবিলাস' পালাতে কৃষ্ণ প্রেমে শুধু রাধা মাতোয়ারা নন, সঙ্গে তার সখিরাও

বিভোর হয়েছেন। কৃষ্ণও সব সখিদের সঙ্গে রসালাপ করছেন, এখানে সে বহুগামী। কৃষ্ণের তাতে সামাজিক কোন বিচ্যুতি ঘটছে না, কিন্তু রাধার ঘটেছে। রাধা প্রেমে মাতোয়ারা কৃষ্ণকে দেখা যায় এই পালায়। পুরুষের নারীর প্রতি এই আনুগত্য পূর্বে দেখা যায় নি। রাধাকে দেখার জন্য কৃষ্ণ ছদ্মবেশও ধারণ করে, এ যেন রাধার জন্য কৃষ্ণের অভিসার। সমসাময়িক 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার মধ্যেও দেখা যাবে সুন্দরের ছদ্ম বেশ। পুরুষের এই ভেক ধারণ সামাজিক দিক থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই। 'বিচিত্র বিলাস' পালাতে কৃষ্ণ, রাধার পা ধরে তার থেকে বাঁশি ফেরত নিতে চায়। এখানে নারীর প্রতি সম্মান যেমন প্রকাশিত হয় তেমনই নারীর ভালবাসাকেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, এই অভিব্যক্তি প্রথাগত নয়। কৃষ্ণকোমল গোস্বামী এক্ষেত্রে অবশ্যতই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্রের জন্যই পালাকার কৃষ্ণকে, পুরুষকে 'শঠ', 'লম্পট', 'কপট', 'রমণী লম্পট' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষায়িত করতে পারেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্নবিলাস' পালাতে নারীর যে মাতৃত্বের ছবি দেখা যায় তা গোবিন্দ অধিকারীর পালার মতন প্রথাগত স্নেহ পরায়ণ মাতৃত্বের ধারণাকে মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে যশোদার হা-হুতাশ সত্ত্বেও সুবল যশোদাকে কিছুদিন কৃষ্ণকে ভুলে থাকার অনুরোধ করলে যশোদা বলে,

> "... বাছা আমার জগৎ-বাছা!
> তা বিনে যে প্রাণে বাঁচা,
> সে বাঁচা কি বাঁচার বাঁচা!
>
> . . .
>
> এখন না দেখিলে বাছা,
> আর সে বাঁচা যায় না বাছা।"[৩]

'বিচিত্রবিলাস' পালাতেও যশোদা কৃষ্ণকে বনে খেলতে যেতে দিতে রাজি নয় কংসের ভয়ে। অদৃষ্টের জন্যই কংস তাঁদের শত্রু হয়েছে। নারীর অদৃষ্টের প্রতি এই আস্থা তাকে আরও দুর্বল করে তোলে, এই ধারা অন্য পালাকারের মধ্যে দেখা যায় না। 'ভরত-মিলন' পালাতেও কৌশল্যার মধ্যে সেই পুত্রের জন্য কাতরতা দেখতে পাওয়া যায়। বিপরীতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃ চরিত্রের উপস্থাপন হবে ভিন্নভাবে, মা সন্তানকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করবেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের হা-হুতাশ যেমন দেখা যায় না তেমন রাধা এখানে সামাজিক-পারিপারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নন। নারীকে এখানে কিছুটা শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। সে জীবনের গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করে। কৃষ্ণ বিরহে রাধা প্রাণ ত্যাগ করতে চাইলে বৃন্দার মুখে জীবনাদর্শনের কথা শোনা যায়,

> "আত্মা পরের, ঘর এই চৌদ্দ পোওয়া ঘর, যতক্ষণ আত্মপর। এই চৌদ্দ পোওয়া ঘরে থাকেন, তখন এই ঘরের আদর সকলেই করে, আত্ম পর ছাড়া হলে, ক্ষণকাল এই দেহঘর রাখে না। তৎক্ষণাৎ শ্মশানে নয়ে যায়।"[৪]

পালাকার প্রধান নারী চরিত্রের মধ্যে এই পরিবর্তন আনলেন না, বরং সামাজিক চিন্তা-ভাবনাকে বদল করার সূক্ষ্ম প্রয়াসের সূচনা করলেন। 'চণ্ডালিনী উদ্ধার' পালায় কর্মফল ও ষড়রিপুর তত্ত্বালোচনা করে কৃষ্ণ, গোপিনীকে সে মুক্তি দেওয়ার কথা বলে। কোথাও যেন পালাকার লিঙ্গের ভেদাভেদ ঘোচাতে শুরু করলেন। আধ্যাত্মিক জড়তার সংশয় থেকে মুক্তি দিতে সেই বালক-পুরুষের ওপরেই নারীকে নির্ভর করতে হয়েছে। 'প্রভাসযজ্ঞ' পালার মধ্যে দাসীকে দেখা যায় সরাসরি নারদের বচনকে অস্বীকার করতে, যেখানে দুইজনের শ্রেণি অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। নারদ যজ্ঞের সুফল হিসেবে স্বামীর কথা বললে হরিদাসী নারদের কথাই মেনে নেয়, কিন্তু দুর্গা নারদকে রাজরানী বেশ আনতে বললে নারদ ভিখারিণীর বেশ নিয়ে আসে কারণ ভিখারির পাশে ভিখারিনীকেই মানায়। দুর্গা সেখানে নারদকে প্রশ্ন করে। যে প্রশ্ন হরিদাসী করতে পারে না সেই প্রশ্নই করে দুর্গা। আসলে এই বৈপরীত্য তৈরি হয় শ্রেণি অবস্থানের ভিন্নতার জন্য। সামাজিকভাবে দুর্গা যে শ্রেণিতে অবস্থান করে, হরিদাসী সেই শ্রেণিতে অবস্থান করে না। এখানে শ্রেণির ধারণা পুরুষ নির্ভর। ফলত স্পষ্ট হয় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধরন এবং নারী চরিত্রের শ্রেণি পরিচয়। শিবের পাশে নারী শিবানী, তাই ভিখারির পাশে ভিখারিনীর বেশই প্রয়োজন। এখানেও নিজের কোন শ্রেণি পরিচয় নারী তৈরি করতে

পারে না। মাতৃ চরিত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পালাতেও নারীর স্নেহ বৎসল রূপটি দেখা যায়। নারদ, যশোদাকে 'মা নন্দরানী' বলে সম্বোধন করলে, যশোদা 'মা' ডাক আবার শোনার অভিলাষী হয়। লক্ষণীয় এখানেও নারীর পরিচয় হয়েছে পুরুষের পরিচয়ে, স্বামীর পরিচয়ে।

এই দশকে কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজের আধিপত্য স্পষ্ট হয়। নারী, তার নিজস্ব কোনো শ্রেণি পরিচয় গড়ে তুলতে পারে না। তার কাছে সতীত্বের মধ্যে দিয়ে স্বামীর কুল রক্ষা করাই বিশেষ প্রয়োজন। মাতৃ চরিত্রেরও কোন উত্তরণ বা বহুমুখিনতা দেখা যায় না। অন্যদিকে 'বিদ্যাসুন্দর'রের যাত্রার জনপ্রিয়তা নারী-পুরুষের আদিরসাত্মক কাহিনির জন্য। সেখানে নারীর সম্মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, বিদ্যার 'কুলবতী যুবতী' সম্মানে আঘাত লাগে না। বিষয় আসলে লোক-মানসিকতার। বিদ্যা যে বিবাহিতা নয়। 'বিদ্যাসুন্দর' পালার একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়। আসলে মানুষ জাতির পরিচয় উটপাখির মতোই। চোখ বন্ধ রেখে ভাবে প্রলয় থেমে আছে। বিবাহিতা নারীর প্রেম তাই 'জঘন্য' তকমা পায় আর বিদ্যাসুন্দর আলাদা যাত্রার সংরূপ সৃষ্টি করে। এই পালার শুরুতে রাজা, রানি, মন্ত্রী সবাই বিদ্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তিত। রাজার কথাতে একদিকে যেমন তৎকালীন সংস্কার বদ্ধ সমাজের কথা দেখা যায় তেমনই পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মূল্যকেও বোঝা যায়,

"মন্ত্রী বলো সুমন্ত্রণা, মেয়ে হয়ে উঠল অরক্ষণা
কেমন করে হবে বিয়ে, তেমন মেয়ের,
পোড়া পণ শুনে যে কেউ আসে না।।"[৫]

নারী এখানে পণ্য। বিংশ শতাব্দীতে মুকুন্দ দাসের যাত্রার দেখা যাবে প্রমীলা এমন ছেলেকে বিয়েই করতে চায় না যে পণ নেবে। দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা সংকলিত করেছেন, সেখানে বিদ্যাকে অনেকটা পরিশীলিত লাগে, রাধার মতন,

"... কীসের অভাব বলো আমার
তুমি থাকতে কও শুনি।
সন্ন্যাসীতে কাজ নাই, সকল তীর্থে দিয়ে ছাই,
সর্বতীর্থময় গঙ্গা তুমি গুণমণি।।"[৬]

এখানে দৈহিক চটুলতা নেই। প্রেম এখানে অনন্ত। বিদ্যা তাই তো বলে,

"... প্রাণ সঁপে তোমারি করে,
বিকায়েছি জন্মের তরে,
না হয় আমি যাব মরে, আর কী হবে"[৭]

উক্তির মধ্যে এক প্রেমের আকুতি রয়েছে, দর্শন রয়েছে। তেমনই পুরুষের প্রতি নতি স্বীকারও আছে। ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা প্রকাশ করেছেন সেখানে নারীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারী সেখানে,

"নারীর হৃদে বিষ মুখে মধু সদাই ছলনা,
থাকতে পতি উপপতি, সদাই বাসনা।।
যখন যার কাছে থাকে, তখনই হয় তার।
কথায় তো যে মিষ্টি হাসে, যেন আপনার।।
মিষ্টি হাসি দৃষ্টি ফাঁসী অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে, বিচ্ছেদের কাটারি।।"[৮]

রাজার মালিনীকে শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও বেশ অপ্রীতিকর। নারীর সামাজিক সম্মানের ন্যূনতম অধিকারও পুরুষের হাতেই ন্যস্ত। রাজার আদেশ, মালিনীর মাথা মুড়িয়ে, গালে চুন কালি মাখিয়ে শহর থেকে বার করে দেওয়ার। এই উক্তি থেকে বোঝাই যায় নারীর সামাজিক-অবস্থান, সম্মান কতটা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে দিয়ে নারীকে যেমন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা খুব পরিণত সমাজ-মানসিকতার পরিচায়ক নয়। মৌখিক রূপের কারণে

পাঠান্তরের সময়ও সংকলকের ব্যক্তি প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই তো দুটো পালার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কোথাও আদিরসের প্রাবল্য আবার কোথাও পালার পূর্ণ সংস্কার করে সুরুচিসম্পন্ন ভাবে প্রকাশিত। এই পর্যায়ে নারীকে যে ভাবে উপস্থাপিত করা হল তার বিপরীতে দেখা যায় মতিলাল রায়ের পালাকে।

মতিলাল রায় যে শুধু যাত্রাকে এক মর্যাদা দান করলেন তাই নয়, তিনি শ্রোতার রুচিরও বদল ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর লক্ষ ছিল সামাজিক ও নৈতিক মান-উন্নয়ন। তাঁর পালার নারী চরিত্রের মধ্যে এক পৌরাণিক ভক্তিমূলক আবহ লক্ষ করা যায়। দ্রৌপদী চরিত্রের মধ্যে তিনি পঞ্চভূতের শক্তিকে একত্রিত করলেন। নারীর প্রতি সামাজিক-মানসিকতাকে তবু অস্বীকার করতে পারলেন না। 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ' পালায় অর্জুনের উক্তিতে নারীর বিষয়ে মতিলালের ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়,

> "যে স্ত্রীলোক পতি ব্যতীত অন্য পুরুষকে অবলম্বন করে, তার অঙ্গ স্পর্শ করতে নাই। তার স্পৃষ্ট অন্নজল, মলমূত্র হতেও অপবিত্র... যে স্ত্রীলোক কামাসক্তা, বিলাসপ্রিয়া, বহুভাষিণী, পরপুরুষানুরক্তা ও ধনগর্বিতা, সে স্ত্রীলোক সর্পিনী স্বরূপা, যে পুরুষকে দংশন করবে সেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হবে, ঐরূপ স্ত্রীতে যে ব্যক্তি রত হবে, সেও সমাজে ঘৃণিত ও পরিণামে অশেষ ক্লেশভাগী হবে, ... যে স্ত্রীলোক অতিশয় হাস্য করে অন্য পুরুষ দেখলে সকল কাজ ভুলে গিয়ে বারম্বার তার প্রতি কটাক্ষ করে, পরপুরুষকে দেখলে গলা চুলকায়, কটিতে হস্ত মর্দন করে ও পরপুরুষ দেখলে মস্তকে অর্ধাকারে অঞ্চল দিয়ে লোক দেখানো বৃথা লজ্জা করে, তাকেই অসতী বলে।"[৯]

পালাকার শুধুই যে এর মধ্যে দিয়ে নারীর সামাজিক চরিত্রকে তুলে ধরলেন তা নয়, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নারীকে দেখালেন। নারীর সামাজিক অবস্থান যে পুরুষের ওপরেই নির্ভরশীল। এই সমাজ যে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার আঁধারে কতটা ডুবে আছে তা 'শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্য' গীতাভিনয়ের মুরলার উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়। সেখানে রোগা, খোঁড়া, বোবা, কালা, নেশাখোর প্রভৃতি যেকোনো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পুরুষকেই স্বামী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মেয়ে-মানুষের মুক্তি, স্বাধীনতা তথাকথিতভাবে এই শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন স্বামী দ্বারাও সম্ভব। এই পালাতেই দশজন নারীর মধ্যে একজন পতিতা থাকলে, সেই দশজনকেই পতিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। সচেতন পাঠক বুঝতে পারেন পুরুষ ও নারীর সামাজিক পরিচিতির পার্থক্য বিস্তর। 'লক্ষ্মণ ভোজন' পালার বিভীষণের মন্তব্য যেকোনো সমাজ ব্যবস্থাকে অনেকটা পিছিয়ে দেয়। মতিলাল রায়ের পালাতে যদিও নারীকে সমাজ সংস্কারক রূপেও দেখা যায়। 'সুবচনী মাহাত্ম্য' পালায় সুতপা মুনির উক্তি,

> "ও মা, তুমি আমার মা, আমাকে আজ হতে তুমি মদ ছাড়ালে।"[১০]

আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ও পরবর্তীকালে মদ্যপান সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছিল। এর কুফল সর্বত্র আলোচিত হলেও কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তাই পালাকারের এই প্রচেষ্টা। তাঁর পালায় একদিকে যেমন নারীকে পুরুষের অধীন দেখা যায়, সংস্কারক হিসেবে দেখা যায়, তেমনই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেও দেখা যায়। 'পাণ্ডব নির্বাসন' পালায় পিতামাতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। মা'র প্রতি মায়ার টানেকে ঈশ্বর লাভের পথে অন্তরায় বলে মনে করা হয় না। 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ' পালায় মাতলির উক্তিতে বাবার থেকেও মায়ের গুরুত্ব দশগুণ অধিক বলে ধরা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সামাজিক-সংস্কারক রূপে মতিলাল রায়কে দেখা গেলেও মানসিক-সংস্কারক রূপে তাকে দেখা যায় না।

'সীতাহরণ' পালায় দেখা যায় একদিকে সীতা যেমন কোমল স্বভাবা, তেমনই তেজস্বী; কিন্তু নারীর কোন সামাজিক অবস্থার থেকে উত্তরণ হয় না। 'নিমাই সন্ন্যাস' পালায় তরঙ্গলতা আর প্রভালতার কথা থেকে জানা যায়, পুরুষ সন্তানের জন্ম দেওয়া একজন নারীর জন্য কতটা প্রয়োজন, পুত্র সন্তান কুলের রক্ষা কর্তা। যদিও কুল রক্ষা করতে নারীকেই কুলটা হতে হয়। তরঙ্গলতা প্রভালতাকে বলে,

> "দুর পোড়ামুখি! আমি বলি কী, তুই বুঝিস কী? বলি, যদি ছেলে না হল তবে কুল ভাঙল না? কুলে থাকবে কে?"[১১]

নারীকে সন্তান উৎপাদনের বস্তু রূপে প্রতিভাত করেছেন পালাকার। বর্তমানের পালাকারেদের পালার মধ্যেও নারীকে উৎপাদন শৃঙ্খলার বস্তু রূপেই দেখা হয়। আগে যেখানে উৎপাদন ছিল জৈবিক এখন উৎপাদন অর্থনৈতিক। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালাতে যেমন 'হতভাগীর বেটা', 'হতভাগীর ছেলে', 'স্বামী অসন্তোষ বর্দ্দিনা নির্লজ্জ কামিনী' ইত্যাদি নারী অসন্তোষমূলক শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল, তেমনই মতিলাল রায়ের এই পালার মধ্যেও 'পোড়ামুখি', 'মাগি', 'পোড়াকপালী' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারীকে সামাজিক দৃষ্টিতে ছোট করে দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় নীলকণ্ঠের পালার অভব্য মন্তব্যের মধ্যে নারী নিজেকেই নিজে কিছুটা হীন করে দেখিয়েছিল, সেখানে মতিলালের পালার মন্তব্য অনেকাংশেই পুরুষের দৃষ্টিতে। নারী পুরুষতান্ত্রিক এই শৃঙ্খলাকে মেনে নিলেও তরঙ্গলতার গানের মধ্যে তাঁর সুপ্ত বাসনার কথা শোনা যায়, সেও স্বাধীন হতে চায়; এই সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে চায়,

> "এ পোড়া দেশের কপালে আগুন,
> নাই কোনো গুণ দ্বিগুণ জ্বালা।
> শুনি অন্য দেশে, আপন বশে, বেড়ায় যত কুলবালা।।"[১২]

ওই পালাতেই দেখা যায় শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মমত্বে ঘেরা সম্পর্ক। শাশুড়ি, বৌমার চিন্তায় বিচলিত হয়ে উঠছেন। গোবিন্দ অধিকারীর পালায় জটিলা, রাধার মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একদমই আগ্রহী ছিলেন না। এই পরিবর্তন আসলে যেমন দর্শক নির্ভর তেমনই আর্থ-সামজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের উপরেও নির্ভরশীল। হরিনাথ মজুমদার, হরিমোহন রায়, ধনকৃষ্ণ সেন, ব্রজমোহন রায়, মনমোহন বসু প্রমুখদের পালার মধ্যেও নারী চরিত্রের বিভিন্ন স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই মানসিকতাই কাজ করেছিল।

হরিমোহন রায়ের 'মানিনী' পালার মধ্যে দেখা যায় চরিত্র হিসেবে নারীর আধিক্য। সেখানে কৃষ্ণ শুধু পুরুষ, আর আটটি নারী চরিত্র। এখানে রাধার প্রবল অভিমান লক্ষ করা যায় পালায়। রাধা নিজের কুল-সম্মান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন কৃষ্ণকে না পাওয়ার অভিমানে। একদিকে নারীর প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা অন্যদিকে সেই শৃঙ্খলাকেই মেনে নেওয়া। কৃষ্ণের অপেক্ষায় রাধা কুঞ্জে থাকতে চায় না কারণ সে 'লম্পটরাজ'। সাময়িক অভিমানের প্রকাশে নারীর চিন্তা-জগতের এই অস্থায়ী পরিবর্তন। সূক্ষ্মভাবে পালাকার তার অভিসন্ধি পূরণ করতে পারলেন। এই পালায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এমনই বৈপরীত্যে ভরা যে রাধার মানভঞ্জন না হলে কৃষ্ণ আত্মহত্যার কথা বলে,

> "রাজার কুমারী যদি চাহে না আমায়,
> এখনি সজনি ঝাঁপ দিব যমুনায়।"[১৩]

এক পুরুষ প্রেমের বিরহে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চাইছেন। সামাজিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাকে এ যেন চুরমার করে দেওয়া। যে কাহিনি এতো কাল কুলবতী সতীর সম্মানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতো সেই কাহিনিই প্রথা ভাঙল। 'পর্ব্বত কুসুম' পালায় দেখা যায় রতিদেবী তাঁর স্বামীর জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা এতোই প্রবল যে দেবকার্য থেকেও রতি, মদনকে দূরে রাখতে চায় মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে। পূর্বের পালাকারদের মতই মেনকার মধ্যে সেই মধ্যবিত্ত সুলভ কন্যার চিন্তা দেখা যায়, যার মধ্যে মাতৃত্বের ছাপ স্পষ্ট। উমাকেও দেখা যায় পতিব্রতা নারী হিসেবে। দেবাদিদেব, কৈলাস ত্যাগ করলে উমাও নিজের রমণীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করে তপস্বিনীর জীবন কাটাতে চেয়েছে। পুরুষের আধিপত্য সামাজিক মানসিকতাকে পুরো গ্রাস করে রেখেছে। তাই সামান্য ব্যাতিক্রম ছাড়া হরিমোহনের নারী চরিত্রের মধ্যে কোন উত্তরণ দেখা যায় না; বরং মধ্যবিত্ত পারিবারিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছবিই দেখা যায়।

ধনকৃষ্ণ সেনের পালাতে দেখা যায় নারী যেমন সংসার জীবনের যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত তেমনই সেই অবস্থা থেকে মুক্তির পথও সে খুঁজে নেয়। শান্তির কাছে যেমন সংসার মরুভূমির সমান, তেমনই শোভা তার কাছে শীতল আশ্রয়। পূর্বের পালাকাররা যে সমাজের ছবি দেখিয়ে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে ধনকৃষ্ণ সেন ব্যাঞ্জনায় তার বিপরীতে গেলেন, সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। পালাকার দেখালেন আপাত দৃষ্টিতে পুরুষের আধিপত্যের সংসার জীবনকে ত্যাগ করে পতিতা গৃহে বাস করতে ও পতিতার দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছে সে। এর মধ্যে ব্যঞ্জনা থাকলেও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 414-424
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী চরিত্রের প্রথা ভাঙার এই অভূতপূর্ব সাহস পূর্বের পালাকারদের মধ্যে দেখা যায় নি। বিংশ শতাব্দীতে এই পালা প্রকাশিত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করার বীজ রোপন করা হয়েছিল। শান্তির ত্যাগ ও সামাজিক-ভাবনার উত্তরণ আসলে ঘটেছিল সম্পূর্ণই স্বামীকে কেন্দ্র করে। তার কাছে স্বামী পতিতালয়েও থাকলে সেটাই বৈকুণ্ঠ ধাম। এ প্রথাগত ভাবনার ভিন্ন প্রকাশ, প্রথাকে মেনে নিয়ে অস্বীকার করা। নারীর দৃষ্টিতে স্বামীর স্থান শোভার কথায় স্পষ্ট হয়,

> "সতী-জীবনে স্বামী-সহাগই যে একমাত্র সুখ, স্বামী-সোহাগিনী না হ'লেও তা বিশেষ জানি। স্বামী-বিরহিণী রাজরাণী আর স্বামী-সোহাগিনী ভিখারিণী, এ দু'য়ে তুলনা ক'র্‌লে, রাজরাণী বড় দুঃখিনী, আর ভিখারিণীই রাজরাণী; কারণ, সে যে স্বামী–সোহাগরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী; ..."[১৪]

এই পরাধীন শতাব্দী এমনই যে নারী বার বার স্বামীর দাসী হয়েই থাকতে চায়। নিজের পরিচয় নিজে তৈরি করতে পারে না, নিজের শ্রেণি থেকে বেরোতে পারে না। এই পতিব্রতা নারীই কিন্তু আবার তার সম্মানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। 'সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক' পালাতে দেখা যায় মনোরমা স্বামীকে হারা হয়ে নিজেকে দোষী করেছে। 'পাষাণী', 'অভাগিনী', 'রাক্ষসী' বলে চিহ্নিত করেছে। ধনকৃষ্ণ সেনের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সুলোচনা। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। অসৎ উপায়ে সুদর্শনকে সরিয়ে সে শত্রুজিৎকে রাজা করতে চায়। সাম্রাজ্যের আধিপত্য নিজের করায়ত করতে চায়। নারী মানসিক দিক থেকে পুরুষের সমগোত্রীয় হয়ে মন্ত্রণা দিতে চায়, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই সিংহাসনে বসে পুরুষই। যাত্রায় নারীকে এ এক অন্য মাত্রায় পাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই মাতৃত্বের প্রকাশও ফলত এক অন্যতর মাত্রা পায়।

ব্রজমোহন রায়ের 'রামাভিষেক' পালাতে কৌশল্যার পরিচয় হয় সন্তানের নামে। রামকে জন্ম দিয়ে সে 'পুণ্যবতী', 'রত্নগর্ভা'। সন্তানের জন্য তাই কৌশল্যার ব্যাকুলতা পালায় প্রাধান্য পেয়েছে। গোবিন্দ অধিকারী বা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মতনই এখানে মাতৃ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন পালাকার। 'তারকাসুরবধ' পালাতেও পার্বতী, শিবের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। শিবের ক্রোধে মদনকে হারিয়ে রতির যে বিলাপ তার মধ্যেও ধনকৃষ্ণ সেনের নারী চরিত্রের আত্ম গ্লানি লক্ষ করা যায়। নিজেকে সে 'পিশাচী', 'রাক্ষসী', 'শৈরিণী', 'দাসী' বলে মনে করে। যে কৈলাসে বিরাজমান মহাদেব স্বয়ং, সেই কৈলাস যখন নরক সম হয়ে ওঠে তখন অপ্রত্যক্ষভাবে পুরুষের ক্ষমতাকেই, অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। পুরুষের প্রতি নারীর প্রবল আনুগত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। রতির গানেই বোঝা যায় পুরুষের প্রতি তার আত্ম নিবেদন,

> "আমি এখনি কোরে দেহপাত,
> এখনি কর্‌বো অগ্নিসাৎ,
> যদি নারী-হত্যার ভয় রাখো নাথ,
> তবে আমায় সঙ্গে নাও হে।"[১৫]

অন্যদিকে পার্বতী যেমন কুমারের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন তেমনই কুমারকে কৃত্তিকাগণের সন্তানের মর্যাদা দিয়ে তাকে কার্তিকেয় নামেও অভিহিত করেছেন। আগের পালায় সন্তানের পরিচয়ে মায়ের পরিচয় হয়েছিলো, এখানে প্রতিপালক, প্রজায়িনির পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হল। এই মাতৃত্ব জৈবিক না হলেও পবিত্র। মুক্ত চিন্তা ধারার এই প্রকাশ শতাব্দীকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল বটেই। পূর্বে যশোদা যেখানে কৃষ্ণকে বনে খেলতে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না সেখানে এই পালাতে পার্বতী তারকাসুরকে বধ করার জন্য কুমারকে শুধু প্রস্তুত করছেন না, তাকে 'বিজয়শ্রী' হওয়ার আশীর্বাদও দিচ্ছেন। লক্ষণীয় যে সময় পালা রচিত হচ্ছে সেই সামাজিক পরিস্থিতি পরাধীনতার। বিভিন্ন বিদ্রোহ সংগঠিত হচ্ছে, নারী ক্রমশ অনুভব করতে পারছে সামাজিক গতিপ্রকৃতি। তাই তো সামান্য হলেও নারীরা এবার নিয়ম ভাঙার প্রচেষ্টায় রত। 'সাবিত্রী-সত্যবান' পালাতে সাবিত্রী নিজের পছন্দের ছেলেকেই বিয়ে করে। রাজা, রানির পাত্র খুঁজে দেওয়ার রীতিকে মেনে নেয় নি, কিন্তু সমাজকে অস্বীকারও করতে পারে নি। নিজেকে সত্যবানের কাছে সেই 'বিক্রিত' করেই রেখেছে সাবিত্রী। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালাতে দেখা যায় সরমার মাধ্যমে সীতা চরিত্রকে এক বৃহত্তর পর্যায়ে পৌঁছে

দেন পালাকার। তাকে বিশ্বজননীর স্বরূপ করে তোলেন। গোবিন্দ অধিকারীর পালাতে ঠিক যেমন রাধার ননদকে দেখা গিয়েছিল তেমনই এই পালাতেও সূর্পণখাকে দেখা যায়। সীতার এক উক্তি স্পষ্ট করে দেয় নারীর নিজের আত্ম পরিচয়ের অভাব,

"... আমি বীর কন্যা, বীর পত্নী, বীর পুত্রবধূ; নির্ভিক ক্ষত্রিয় কুলে আমার জন্ম!"[১৬]

নারীর নিজস্ব কোন পরিচয়ের প্রকাশ দেখা যায় না সমগ্র শতাব্দীতে। আত্ম-পরিচয়ের প্রত্যাশাও তার মধ্যে নেই। সীতার দেহত্যাগ বরং পুরুষের কাছে যেন এক বার্তা, অসম্মানের প্রতিশোধের। নারী অসম্মানের প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হতে পারে না। যে অসম্মান সে পুরুষের থেকে পেয়েছে তাকে স্বীকার করে আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই তার মুক্তি ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে দেখা যাবে এই নারীরাই অসম্মানের প্রতিশোধ স্পৃহায় কতটা উজ্জ্বল, বিদ্রোহী। নারীর এই বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা পরিবর্তিত করে মনমোহন বসু তাঁর পালা রচনা করলেন।

মনমোহন বসু যে সময়ে পালা রচনা করছেন সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থা পরাধীনতার। তাই তাঁর পালার মধ্যেও এই সময়ের ভাবনার প্রকাশ দেখা গেল, কিন্তু রূপকের আড়ালে। পৌরাণিক কাহিনিকে যদিও তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। এর কারণ অবশ্যই সত্যের প্রকাশে রাজরোষের শিকার হওয়া। একদিকে যেমন তিনি দীর্ঘ শতাব্দীর প্রথাগত বিষয়কে গ্রহণ করলেন তেমনই রূপকের আশ্রয়ে সমাজ পরিস্থিতির বর্ণনাও দিলেন। তাঁর বেশিরভাগ পালার যদিও নারী চরিত্রদের কোন উত্তরণ বা প্রথা ভাঙার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতিটা নারীই সেখানে যেন সরলরৈখিক।

'সতী নাটক' পালার মধ্যে দেখা যায় প্রসূতী দক্ষকে উচিত-অনুচিতের দর্শন বোঝাচ্ছে। যেকোনো সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে যেমন বাবার ভূমিকা থাকে, তেমনই মায়েরও ভূমিকাও থাকে। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা, সে পিতা-মাতার সন্তান। শিবের অপমানে দক্ষ অথচ নিজের কন্যাকেই ত্যাগ করেছেন। সন্তানের থেকেও পুরুষের কাছে নিজের মান-সম্মান অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ সন্তান নারী। এখানেও নারীর নিজস্ব পরিচয় গড়ে উঠতে দেখা যায় নি। সে নয় পত্নী বা কন্যা, তাই তো দক্ষ বলে 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী'। নারীকে যদিও দেখা যায় পুরুষের সামনে নিজের অভিমত প্রকাশ করতে। যজ্ঞ পণ্ড করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক করতে, পুরুষের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করার প্রচেষ্টায় রত হতে। অন্যদিকে সতীকে দেখা যায় শিবের সেবার নিয়োজিত দাসী হিসেবে। সতীর কথায় নারীর শ্রেণি অবস্থান নির্দিষ্ট হয় পুরুষের প্রেক্ষিতে। দক্ষের কন্যা হয়ে যে শ্রেণিতে সতী ছিল, শিবের পত্নী হয়ে সেই শ্রেণি অবস্থানে সে নেই। এখানেই এসেছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। পুরাণের দক্ষের যজ্ঞের ঘটনাই পালাকার উপস্থাপিত করলেও পালার শেষে এক নতুন সামাজিক ধারার প্রবর্তন করলেন। এক দেহে শিব ও সতীর অবস্থান দেখালেন। নারী ও পুরুষের বৈপরীত্যের সহাবস্থানে যখন সৃষ্টি গতিময়, তখন একই দেহে এই বৈপরীত্যের মিলন ঘটিয়ে সামাজিক লিঙ্গভেদের প্রথাকে কোথাও যেন ভাঙতে চাইলেন।

একদিকে যখন 'রাসলীলা নাটক'এ দেখা যায় নারীর প্রতি অরুচিকর শব্দ ব্যবহার করতে, 'নচ্ছারী', 'ছুঁড়ী', 'কালামুখী', 'ঝ্যাঁটা মার', 'মাগী', 'ডাইনী' ইত্যাদি তখন অন্যদিকে রাধা তার মনের মতন করে কৃষ্ণের জন্য কুঞ্জ সাজাবার নির্দেশ দেন। কুটিলার বাধাকে অস্বীকার করে এক বিবাহিতা নারীর এই ভাবে নিজের অভিলাষ পূরণ করতে এর আগের পালাকারেদের পালার মধ্যে দেখা যায়নি। ব্রজমোহনের পালার মতোই 'রামাভিষেক নাটক' এর মধ্যে চিত্রা, কৌশল্যার মঙ্গল কামনা করে তাকে 'রাজ রাণী'র মতন 'রাজ মাতা' হয়ে উঠতে প্রার্থনা করে, নারীর পরিচয় আবারও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। একদিকে পতিভক্তি অন্যদিকে সন্তানের প্রতি বাৎসল্যেই এই পালা গতি পেয়েছে। 'প্রণয় পরীক্ষা' পালাতে কিন্তু মনমোহন বসু দেখালেন প্রথম 'শিক্ষিত' নারীদের। ভেঙে দিলেন সামাজিক সমস্ত বিধি নিষেধের ব্যবস্থাকে। সরলাকে দিয়ে কবিতাও রচনা করিয়ে, সুশীলাকে শিক্ষা দিলেন বিষয়-কর্মের। নারীকে তার সামাজিক-পরিবারের গণ্ডি থেকে বের করে আনছেন তিনি। পরাধীন দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কতটা প্রত্যাশিত ছিল তা এই পালার থেকে বোঝা যায়। রাধা ও কুটিলার সম্পর্কই এখানে সুশীলা ও সরলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। বৈষম্য ও সহাবস্থানের এক অভূতপূর্ব মেল বন্ধন। পালাকার বামুনঠা'ক্রণ চরিত্রকে পুরুষের সঙ্গেই গানবাজনা শেখালেন।

রূপকের মধ্যে দিয়ে হলেও সামাজিক সংস্কার করলেন। তিনি বুঝে ছিলেন পুরাতন এই সামজিক আধিপত্য আর টিকিয়ে রাখলে স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। 'প্রণয় পরীক্ষা' তাঁর অনেক আগের পালা, সেখানে 'সতী', 'রামাভিষেক', 'রাসলীলা' অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো শাসকের কঠোরতায় সামাজিক-রাষ্ট্রিক বাধাকে কিছুটা স্বীকার করেই নিয়েছিলেন তিনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় নারী চরিত্রদের মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়ে ছিল তা নয়, তবে চরিত্রদের বিস্তার যে সরল রেখায় হয়েছে তাও নয়। ব্যাতিক্রম থাকলেও তা সমাজ পরিবর্তন করতে পারে নি, তবে সূচনা করতে পেরেছে। পরবর্তী শতাব্দীতে যে বিপুল পরিবর্তন মুকুন্দ দাস থেকে উৎপল দত্তের পালার মধ্যে দেখা যাবে সেই পথ তৈরি করে দিয়েছে এই শতাব্দী। আসলে যেকোনো চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-ধর্মীয় প্রভাব খুব বড়ো ভূমিকা পালন করে। এই পর্যায়ের প্রায় সব পালাকারই পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে পালা রচনা করেছেন। যাত্রার প্রথাগত বৈশিষ্ট্যই হল পুরাণের পরিচিত কাহিনি ও মিলনান্তক পরিণতি। এই পর্বে যাত্রার নিজস্ব চারিত্রিক পরিবর্তন এতই হয়েছে যে চরিত্রের বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নি, তবে বিংশ শতাব্দীর যাত্রার মধ্যে একদিকে যেমন শিক্ষিত নারীদের দেখা যাবে তেমনই অন্যদিকে নারী পণ প্রথার বিরোধিতা করে বিয়েতে অস্বীকার করবে। পুরুষতান্ত্রিক যেকোনো নিয়মকে অস্বীকার করবে, প্রতিবাদ করবে, নিজের স্বাধিকারচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হবে, সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা দেখাবে। নিজের পরিচিতি তৈরি করবে, শ্রেণি অবস্থানকে স্পষ্ট করবে। তাই দুই শতাব্দীর এই বিপুল পরিবর্তন যেকোনো সচেতন পাঠককে আকৃষ্ট করবে, আগ্রহী করবে এই বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধানে।

Reference :

১. দে, পাঁচকড়ি, সম্পাদক, *কৃষ্ণযাত্রা,* খণ্ড ৫, কলকাতা, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৩৭, পৃ. ৬

২. দে, পাঁচকড়ি, সম্পাদক, *কৃষ্ণযাত্রা,* খণ্ড ৫, কলকাতা, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৩৭. পৃ. ২৯

৩. গোস্বামী, কামিনীকুমার, সম্পাদক, *কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য*। পরিবর্ধিত সংস্করণ, কামিনীকুমার গোস্বামী, ১৩৩৬, পৃ. ৮২

৪. বেরা, শ্যামল, সংকলক ও গ্রন্থনা, *কৃষ্ণযাত্রা,* পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, মার্চ ২০১৩, পৃ. ২২৩

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, সংকলন ও সম্পাদনা, *নির্বাচিত বাংলা, প্রথম খণ্ড : প্রথম অংশ উনিশ শতক,* কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ১৪৮

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, সংকলন ও সম্পাদনা, *নির্বাচিত বাংলা, প্রথম খণ্ড : প্রথম অংশ উনিশ শতক,* কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ২২২

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, সংকলন ও সম্পাদনা, *নির্বাচিত বাংলা, প্রথম খণ্ড : প্রথম অংশ উনিশ শতক,* কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ২২৩

৮. উড়ে, গোপাল, *আসল বিদ্যাসুন্দর।* কলিকাতা, ভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক), ১৩২০, পৃ. ১০৫

৯. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়,* সুপ্রকাশ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬২

১০. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়,* সুপ্রকাশ, নভেম্বর ২০১৮, পৃ. ২৬৪

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, সংকলন ও সম্পাদনা, *নির্বাচিত বাংলা, প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় অংশ উনিশ শতক,* কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ৪৩৭

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্, সংকলন ও সম্পাদনা, *নির্বাচিত বাংলা, প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় অংশ উনিশ শতক*, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ৪৩৬

১৩. রায়, হরিমোহন, *মানিনী*, সুপ্রকাশ, কলিকাতা, হরিমোহন রায়, ১২৮১, পৃ. ২৬

১৪. সেন, ধনকৃষ্ণ, *বিল্বমঙ্গল*। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৩১, পৃ. ৩

১৫. রায়, ব্রজমোহন, *ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩, পৃ. ৯৭

১৬. রায়, ব্রজমোহন, *ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩, পৃ. ৩৩১